তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি

মানুষ যখন থেকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল, তখন থেকে সূচনা হল সভ্যতার - মানব সভ্যতার। একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষ এবং প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের লব্ধ ফলই হল তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে অনিবার্যভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতি রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। ইতিহাস বলতে কতকগুলি ঘটনার সন্-তারিখ বা যুদ্ধের বিবরণ পঞ্জীকে বোঝায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাস এগিয়ে চলে তার নিজস্ব দ্বান্দ্বিক নিয়মেই। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগে এদেশে অশিক্ষিত অবহেলিত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রণব সরকার মহাশয় যথার্থই বলেছেন-

"আর্যরা তো বিদেশী পরগাছা মাত্র, তাদের সংস্কৃতির শেকড় তো আলগা। লোকসংস্কৃতির মৌখিক রূপ তো দীর্ঘকাল নিরক্ষর, অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেঁচে ছিল।"[১]

এই অনার্য সম্প্রদায়ের আদিম মানুষগুলোকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অনাব্রত' বলেছেন। এরাই এদেশের আদি বাসিন্দা। আদিম এই জাতিগুলি আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গভীর অরণ্যের পার্বত্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। কৃষি সমাজ ও মূলতঃ এই অনার্যদের দান। ডঃ দুলাল চৌধূরীর ভাষায় —

"বাংলার সমাজ মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক। গারো, হাজং, রাজবংশী, কোচ, চাকমা, সাঁওতাল, মুন্ডা, কুর্মী, মাহাতো, বাগদী, বাউরী, ডোম, কৈবর্ত, চন্ডাল, শবর প্রভৃতি কোম জনসাধারণ বাংলার প্রাচীন অধিবাসী। আমরা আজকের বাঙ্গালিরা তাদেরই বংশধর, উত্তরসূরী। তাদেরজীবনের মর্মমূলেই আমাদের প্রাণ। তাদের সংস্কৃতির উপর চিরায়ত সংস্কৃতির ইমারত গড়ে উঠেছে।"[২]

সভ্যতার প্রতিটি পর্যায়ে ইতিহাসের রথচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে। আর এরই ফলে উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস। আর বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের সূত্রে নিরন্তরভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রচিত হয়ে চলেছে। সংস্কৃতি অর্জনের জন্য মানুষকে কয়েক লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। মানুষের সংস্কৃতি তার স্রষ্টার জ্ঞানও পরিশীলন নিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতে হতে বহমান থাকে। মৈত্রী, বিবাহ, সহযোগিতা, শত্রুতা অথবা অর্থনৈতিক লেনদেন - ইত্যাদির সূত্রে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের বিনিময়ে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটলেও মূল সাংস্কৃতির বেশিরভাগটাই অক্ষুন্ন থাকে। সংস্কৃতি বিবর্তনের নিয়ামক হল আর্থসামাজিক বিভিন্ন উপলক্ষ। বস্তুতঃ বাঁচবার প্রয়োজনে মানুষ তার ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। তবে শ্রম পদ্ধতির প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ যে কেমনভাবে ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিখুঁত চিত্রায়ন করেছেন —

"জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে - সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতোরের ঘরে ঢেঁকি, স্বর্ণকারের ঘরে টাকা দামের মোটরি নির্মান হইতেছে - তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্য ও চলিতেছে; তার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ডভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।"[৩]

সংস্কার শব্দের রূপ বিবর্তনে সংস্কৃতি শব্দটি গড়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতি শব্দটির দুটি মৌল অর্থ আছে - (১) যাহা মন ও উপলব্ধিকে সংস্কার বা পরিমার্জন করে এবং (২) যাহা ঐতিহ্যগতভাবে এক একটি ভাবনা বা অভ্যাসকে বিবর্তিত করে। সুতরাং জীবনের সব পর্যায়ে সংস্কৃতির অভিক্ষেপ থাকেই। মানুষের বাস্তব জীবন যাত্রার সহায়ক

বস্তু উপকরণ এবং ব্যবহারিক জীবন যাত্রার সহায়ক মানস উপকরণ-দুইই সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ সংস্কৃতিকে তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয় বলে চিহ্নিত করেছেন —

"জীবন-যাত্রার নিয়ম পদ্ধতি, জীবন-যাপনের যাবতীয় বস্তু উপকরণ এবং মানসফসল।"[৪]

আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি জীবনযাত্রার নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু উপকরণের মধ্যে আছে ঘরবাড়ি, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, আসবাবপত্র, যানবাহন, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, খাবার সামগ্রী ইত্যাদি। এছাড়া সাহিত্য, নৃত্যগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি মানস ফসলের মধ্যে পড়ে। এ সমস্তেরই সমন্বয়িত রূপ হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি এক চলমান কর্মপ্রয়াস - মানব জীবনের অগ্রগতির পথে তার নিরন্তর পদযাত্রা। এবিষয়ে ডঃ মুনমুন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য —

"সংস্কৃতির তিনটি বৃহত্তর রূপ আছে। যেমন - নগর সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতি ও আদিম সংস্কৃতি। ঐক্যবদ্ধ আদিম সমাজ থেকে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন বিকাশের সূত্রে লোকায়ত সংহত সমাজ পটভূমিতে লোক সংস্কৃতির সৃষ্টি। লোক সংস্কৃতির ও প্রধাণত দুটি রূপ আছে। প্রথমটির আত্মপ্রকাশ গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনধারাকে ঘিরে। নিত্য ব্যবহার্য তৈজস, আসবাব ছাড়াও সামাজিক উৎসব, লোকাচার এই পর্যায়ভুক্ত। লোকসংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারায় পাওয়া যায় লোকসমাজের ব্যক্তিচেতনার সমষ্টিগত রূপকে। এই পর্যায়েই পড়ে লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকচিত্র",[৫]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' বিভিন্ন পালায় লোকসংস্কৃতির নানা দিকের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একদিকে লোকপুরাণ, লোককথা, কিংবদন্তী, লোকগান, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকনাট্য, লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকধর্ম, লোকদেবতা, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোকপোষাক, লোকউৎসব প্রভৃতি বিষয়গুলি সভ্যতার আদিকাল থেকে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে আসছে।

জনজীবনের ক্রমন্বিত বিবর্তনের পরিচয় অনুসন্ধান করা যথার্থ অর্থে ইতিহাস চর্যা। এই পরিচয় অন্বেষণেরই একটি সফল পদ্ধতি হল সংস্কৃতির বিশেষত ঃ লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করা। প্রাচীনকালে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদকে লোকসংস্কৃতির আকর গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হত। তবে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয় ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই হিসেবে ঔপনেবেশিকতার সূত্রেই আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা হয়। 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলিকে আশ্রয় করে উইলিয়াম কেরী দেখিয়েছেন লোকপ্রথা সংগ্রহ ও সংকলন যোগ্য। এখানে প্রখ্যাত লোক ঐতিহ্যের অনুরাগী গবেষকের মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য —

" আধুনিক বিদ্যাচার্চার সূত্রেই এলো ফোকলোর চর্চা। উনিশ শতকের শুরুতেই বিদেশী মিশনারিদের কল্যাণে এদেশে ফোকলোর চর্চার সূচনা । এবিষয়ে পথীকৃতের সম্মান প্রাপ্য উইলিয়ম কেরির (১৭৬১- ১৮৩৪)। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'ইতিহাস মালা', একশো পঞ্চাশটি গল্পের সংকলন ।"[৬]

আবহমান কালধরে বাংলার লোকসংস্কৃতি লোকসমাজের লৌকিক সৃষ্টি হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিআকর্ষণ করে চলেছে। তবে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণ করতে হলে নৃ-বিদ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে অতীত লোকঐতিহ্য ও লোক পরম্পরার লৌকিক ধারাবাহিকতা অনুধাবন করতে না পারলে কোনো জাতির সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। লোক সংস্কৃতির উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে এমন একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, যা আন্তর্জাতিক স্তরে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ হিসাবে বিবেচনা যোগ্য—

"এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই। এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্ন ও কাহার ও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুনে ইহারা আজ রচিত হইলে ও পুরাতন, ও সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলে ও নূতন।" [৭]

প্রথমদিকে লোকসংস্কৃতি চর্চা বলতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করাকে বোঝানো হত। সর্বপ্রথম লোকসংস্কৃতি চর্চার কাজ শুরু করেছিল ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি। পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান লোকসংস্কৃতির চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেগুলির মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, অ্যাকাডেমী অফ ফোকলোর এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনায় যে সমস্ত মনীষী গবেষক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অতুলসুর, সুহৃদ কুমার ভৌমিক, দুলাল চৌধুরী, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াকিল আহমেদ, মযহারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকি প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি চর্চাকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যান দীনেশচন্দ্র সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনের ধারাকে প্রবহমান রেখে বর্তমানে যারা লোকসংস্কৃতি নিয়ে নিত্য নতুনভাবে আলোচনা, পর্যালোচনা, ক্ষেত্র গবেষণা ও গবেষণা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে মানস মজুমদার, অচিন্ত্য বিশ্বাস, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, দীপক রায় প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ইংরাজী *Folklore* শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী হবে তা নিয়ে এপার বাংলা, ওপার বাংলা - উভয় বাংলাতে আলোচনাও পর্যালোচনা কম হয়নি। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম থম্‌স্ নামে জনৈক ইংরেজ পন্ডিত সর্বপ্রথম সাধারণ অশিক্ষিত জনগণের ঐতিহ্য নির্ভর সংস্কৃতিকে বোঝানোর জন্য *Folklore* শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আবার জার্মান পন্ডিতগণ *Folk* শব্দটি দিয়ে জাতিগত অর্থে *Common People* কখনো বা *Primtive People* কে বুঝিয়েছেন। বাংলায় এই ইংরাজী শব্দদুটির অর্থ যথাক্রমে 'সাধারণ গণসমাজ' ও 'সমাজের নিম্ন উপজাতি'। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঠিক *Primtive* বলা যায় না - এই সমাজকে জনসাধারণের সমাজ বলাই ভালো। আবার আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানীরা মৌলিক সংস্কৃতির অধিকারী মানব গোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য *Folk* শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা *Folk* অর্থে লোক শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। প্রসঙ্গতঃ যে এপার-ওপার - দুই বাংলাতে *Folk* অর্থে লোক শব্দটিকে সবাই মেনেও নিয়েছেন। এখন *Lore* শব্দটির প্রতিশব্দ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে - প্রাচীন ইংরাজীতে শব্দটি ছিল *Lar,* ডাচ ভাষায় *Lier* এবং জার্মান ভাষায় *Lehre*। তবে শব্দটির মূল উৎস নিহিত রয়েছে প্রাচীন টিউটনিক ভাষার মধ্যে, যার অর্থ হল জ্ঞানদান বা জ্ঞান আহরণ করা। পরবর্তীকালে অর্থ পরিবর্তনের ধারায় *Lore* শব্দটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়িয়েছে *Wisdom of the Folk*।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিখ্যাত আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ্ উইলিয়ম বেসকম্ *(William Bescom) Folklore* কে সংক্ষেপে বলেছেন—

"*Verbal Art* বা কথ্য শিল্প।" [৮]

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মুখে মুখে পূর্বপুরুষদের সময় থেকে বর্তমান কাল অবধি যে সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবহমান, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ফোকলোরের উপাদান সমূহ। আর সে কারনে আজ থেকে —

"প্রায় অর্ধ শতাব্দীপূর্বে বিখ্যাত পন্ডিত আর.পি.চন্দা *Folklore*
এর প্রতিশব্দ হিসাবে লোকবিদ্যা শব্দটি ব্যবহার করেন।" [৯]

প্রসঙ্গতঃ যে মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং এনামুল হক এই 'লোকবিদ্যা' শব্দটি সমর্থনও করেছেন। তবে মহম্মদ শহীদুল্লাহ *Folklore* এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকবিদ্যা' শব্দটিকে সমর্থন করেলেও তিনি নিজে ভিন্ন মত পোষণ করেন —

"শ্রদ্ধেয় ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৩৩৬ সালে প্রদত্ত একটি ভাষনে কোনরকম যুক্তিতর্ক না দিয়েই লোকবিজ্ঞান শব্দটি ফোকলোর শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন।" [১০]

তবে মনে রাখা দরকার ফোকলোর কোনো শিক্ষিত বা মার্জিত রুচি সম্পন্ন মানুষের গ্রন্থগত বিদ্যা নয়, পুরুষানুক্রমে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই ফোকলোর এর উৎপত্তি। তবে 'লোকবিজ্ঞান' শব্দটি ফোকলোরের যথাযথ প্রতিশব্দ হতে পারে না। কারন ফোকলোরের উপাদানগুলিকে কোনোভাবেই বিজ্ঞান বলা সঙ্গত হবে না। কেননা লোককাহিনী কখনো বিজ্ঞান হতে পারে না। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী —

"ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে লোকযান শব্দটি ব্যবহার করেছেন।" [১১]

মনে হয় বৌদ্ধ হীনযান বা মহাযান শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় 'লোকযান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে 'লোকযান' অর্থে সাধারণ লোকের ধর্মীয় কার্যকলাপ হয়তো বোঝানো যেতে পারে কিন্তু ফোকলোর শুধুমাত্র লোকধর্ম নয় এর ক্ষেত্র আরো বহুবিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে —

"ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য Folklore অর্থে বাংলা লোকশ্রুতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।" [১২]

শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যের মতে যা শুধুমাত্র শ্রবন করে শেখা হয় সেগুলিই লোকসাহিত্য। কিন্তু *Folklore* এর এমন অনেক উপাদান আছে যা শুনে শুনে শেখা অসম্ভব, যেমন-লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকশিল্প প্রভৃতি। আবার প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতি গবেষক ও সমালোচক ড. মযহারুল ইসলাম বলেছেন —

"ফোক্ শব্দের বঙ্গানুবাদ লোক শব্দের সঙ্গে ইংরাজী লোর শব্দটি অপরিবর্তিতরেখে আমি লোকলোর শব্দটি উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছি।" [১৩]

তবে ড. ইসলামের 'লোকলোর' শব্দটি বাংলা ও ইংরাজী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত সংকর শব্দ । বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বিদ্ আশরাফ সিদ্দিকী ফোকলোর শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে তিনটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন - লোকবিজ্ঞান, লোকতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি। ফোকলোর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য—

" বাংলায় আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলি, তা ইংরাজী Folklore কথাটির অনুবাদ বা প্রতিশব্দ নয়। ইংরাজী Folklore কথাটি আর ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতেFolklore বলতে যা বুঝায় তা স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত -১.Material Folklore বা লোকশিল্প এবং ২. Formalised Folklore বা লোকসাহিত্য "। [১৪]

ফোকলোর শব্দটির সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিশব্দ কি হবে সে বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—

" ভারতীয় ভাষায়, Folklore শব্দটির সর্বজনগৃহীত কোনো প্রতিশব্দ নেই, অনেকে অনেক রকম অনুবাদ করছেন, কিন্তু কেউ কারো অনুবাদ গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করেননি। যদিও লোকসংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে ইংরাজী Folklore শব্দটির ভাব পুরোপুরি বুঝায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে বহুল প্রচারিত হয়েছে বলে, এই শব্দটি এখানে গ্রহন করা হল। " [১৫]

উইলিয়াম থমস্ নামে ইংল্যান্ডের এক জনৈক পন্ডিত ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'দি এ্যাথেনিয়াম' পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে প্রথম *Folklore* শব্দটি ব্যবহার করেন। এ রূপর থেকে *Folklore* শব্দটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক শুরু হয়। তবে সর্বজন স্বীকৃত যে, পুরুষানুক্রমে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই *Folklore* এর উৎপত্তি এবং স্থিতি। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, একটি জনসমাজে মৌখিক ঐতিহ্যের

মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রচলিত হয়ে বিস্তার লাভ করে তার সবগুলোকে ফোকলোর বলা ঠিক হবে না। ফোকলোর এর এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলির ঐতিহ্য বাহিত হয় লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে। তাই *Folklore* যুগে যুগে মৌখিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সত্য কিন্তু পরবর্তীকালে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে লিখিত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। আবার কোনো কোনো *Folklore* বংশ পরম্পরায় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এগুলি কখনো মৌখিক ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহন করে না। এ প্রসঙ্গে লোকভঙ্গি, লোকনৃত্য ও লোকক্রীড়ার কথা বলা যেতে পারে - যেগুলি মুখে শুনে নয় দেখে শিখতে হয় । অনুরূপভাবে লোকশিল্প (*Folk Arts and Crafts)* সৃষ্টির পদ্ধতি অশিক্ষিত বা শিক্ষিত সমস্ত শিল্পীকে দেখেই শিখতে হয়। এইসব আলোচনা সূত্রে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে *Folklore* কী ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ বলেছেন—

"ফোকলোর এক একটি মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবন ব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সূত্রে গ্রোথিত। ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলির সৃষ্টি করে এবং সবক্ষেত্রেই তা ব্যক্তির সৃষ্টি, তবে মাঝে মধ্যে দলগতভাবে ও সৃষ্টি হতেপারে, যেমন কোনো কোনো সঙ্গীত বা গীতিকা, হেঁয়ালি, ক্ষদ্রকাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি। তবে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির সৃষ্টি হলে ও কলের প্রবাহে যখন সেই সৃষ্টি একটি ব্যাপক জনসমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনই তা ফোকলোর হয়।" [১৬]

ফোকলোর এর সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে অনেকেই সহজ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রবাহিত সাহিত্যের ধারাই আসলে ফোকলোর। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সাহিত্য ছাড়া ও পুরুষানুক্রমে আরো অনেককিছুই মুখে মুখে প্রবাহিত হয় । এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কার, লোকমন্ত্র, লোকবিশ্বাস প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে - এগুলি সবই ফোকলোর এর অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির লোকসংস্কৃতি গবেষণা সংক্রান্ত কমিটির প্রধান *A.H. Gayton* ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ৬২তম বার্ষিক সম্মেলনে লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"From the results of that Survey it appeared that Folkore not be defined though many were willing to try. Indeed trying to define Folkore seems to be a favourite Pasttime of its devotees" [১৭]

আবার আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ উইলিয়াম বেসকম্ এর মন্তব্য এরকম—

"Definition and classification are neither particularly interesting nor necessarily fruitful, but it any field of study needs clarification of its basic terminology it is clearly Folklore, which has so long been pagised by inconsistant and contradictory definition." [১৮]

তবে কালের নিরিখে সমাজের পারিপার্শ্বিকের বিবর্তিত রূপের মধ্যে দিয়ে লোকসংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে চলেছে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাপথে। এই হিসাবে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যগত রূপ ক্ষেত্রবিশেষে ঐতিহাসিক কিংবা নৃ-বিজ্ঞানের ধারায় বিশ্লেষিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'ডন বেন এমস্' এর মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য—

".....the traditional charater of Folklore is an analyticl construct. It is a scholary and not a cultural fact.....therefore, traditional should not be a criterian for the definition of folklore in its context..... some traditions are folklore, but not all folklore is traditional." [১৯]

ফোকলোর সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা দানের জন্য আমরা একালের প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ 'আর্চার টেলর' এর উক্তি স্মরণ করতে পারি—

"Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word of mouth or by custom and practice, It may be folk songs, Folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or Easter eggs ; traditinal ornamentation lilke the walls of Troy ; or traditional symbols like the swastika It may be traditional procedures like throwing salt over once shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the nation that elder is good for ailments of the eye. All these are Folklore."[২০]

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ফোকলোরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন —

" লোকশ্রুতি বলতে আমি ইংরাজী Folklore কথাটাই বুঝাইয়াছি, তবে Folklore কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এখানে আমি তা সীমায়িত করিয়া বাংলা লৌকিক ধর্ম ও লোকাচারকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি। "[২১]

তবে এই সংজ্ঞায় ফোকলোরের অধিকাংশ উপাদানই অনুপস্থিত । ফোকলোর এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে অরুণ কুমার রায় বলেছেন—

যে সজীব উপাদান সমূহঃ মানব সভ্যতার ঊষাকালে যৌথ প্রয়োগে সর্বজনগ্রাহ্য উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অতিক্রম করে এবং নব অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বলতর সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক ভান্ডারে সঞ্চয় রূপে দেখা দেয, তাকেই লোকায়ন (Folklore) বলে। "[২২]

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার বলেছেন

"লোকসংস্কতি বলতে আমরা মূলতঃ বুঝেছি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম। "[২৩]

উপরোক্ত বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ দের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ আলোচনা পর্যালোচনা করলে আমরা ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই—

১. মানব সভ্যতার ঊষাকালে লোকসংস্কৃতির জন্ম।
২. লোকসংস্কৃতি সাধারণ অশিক্ষিত মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি।
৩. লোকসংস্কৃতি মৌখিক ভাবে প্রচলিত ও পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত।
৪ লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যগত ধারায় আবর্তিত।
৫. লোকসংস্কৃতি যৌথপ্রচেষ্টার ফসল।
৬. চক্রবৎ পরিবর্তনশীল হওয়ায় লোকসংস্কৃতি নতুন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নবতর সংস্কৃতির সৃষ্টি করে।
৭. লোকসংস্কৃতি শ্রেণীভুক্ত সমাজ অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে।
৮ লোকসংস্কৃতির কিছু অংশ অঙ্গভঙ্গিগত, কিছু অংশ বস্তুগত আবার কিছু অংশ লিখিত রূপে আবর্তিত।

৯. লোকসংস্কৃতি সর্বজনগ্রাহ্য ।

১০. কৃষিভিত্তিক জীবনের বাইরে লোকসংস্কৃতির অস্তিত্ব অভাবিত।

১১. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি লোকসংস্কৃতির ভিত্তি।

১২. লোকসংস্কৃতি আদিম লোকসমাজের সাংস্কৃতিক জীবাশ্ম।

১৩. অকারণ আনন্দ থেকে লোকসংস্কৃতি রূপ মৌখিক শিল্পের জন্ম।

সকল দেশের সাহিত্যের একটি সনাতন রীতি হল, লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে অতীতে প্রত্যাবর্তন করা। লোকসংস্কৃতি ব্যষ্টির হয়ে ও আজ সমগ্র লোকসমাজের সম্পদ হয়ে উঠেছে। কালের বহমান ধারায় লোকসংস্কৃতির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগত ধারণাগুলির সংশোধনের সময় এসেছে। লোকসংস্কৃতি আজ আর শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে সীমায়িত না থেকে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হয়ে, শ্রেণীহীন সমাজে ও অবস্থান করে। আবার শুধু গ্রাম নয়, অরণ্য, নগর-সভ্যতার সর্বত্রই আজ লোকসংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছে। অধুনা লোকসংস্কৃতির অবস্থান সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক - সমাজের সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়। আবার লোকসংস্কৃতি কোনো বিশেষ একটি সমাজের জীবাশ্ম নয়, তা চিরবহমান-অমর। আবার শিক্ষা ও সভ্যতা লোকসংস্কৃতির অন্তরায় নয়। অকারণ আনন্দ থেকে লোকসংস্কৃতির জন্ম - একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বরং শ্রমপ্রক্রিয়া থেকেই লোকসংস্কৃতির জন্ম। আবার লোকসংস্কৃতি শুধু মৌখিক শিল্প নয়- এক্ষেত্রে লিখিত অলিখিত সর্বপ্রকার রূপভেদ আছে।

এবার প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের একাধিক লোকসংস্কৃতিবিদ গণের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা মতাদর্শের আলোচনা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাক—

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমন্ডলে দলগত বা সমষ্টিগত মানুষের ঐতিহ্যগত ধারায় ঐক্যবদ্ধ আদিম সমাজ থেকে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবনবিকাশের সূত্রে লোকায়ত সংহত সমাজ পটভূমিতে কোনো একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্মবিশ্বাস, রীতিও নীতবোধ, খেলাধূলা ও উৎসব, ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা , লৌকিক প্রবাদ প্রবচন ও ছড়া, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবন ধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই আমরা লোকসংস্কৃতি বলে গ্রহন করতে পারি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ গনের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ মতামতগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তমান সংস্কৃতিতে বর্তেছে সেগুলিই মূলতঃ লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই উপাদানগুলি ঐতিহ্য ভিত্তিক বলে কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও জীবিত রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে মৌখিক ভাবে যে সমস্ত শিল্পসাহিত্য বংশ পরম্পরায় বর্তমানে চলে এসেছে সেগুলি সমস্তই লোকসংস্কৃতির উপাদান। যেমন - ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোককাহিনী, লোককবিতা, লোকগীতিকা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি। লোকসংস্কৃতিবিদগণের মধ্যে কেউই লোকসংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে লৌকিক ধর্মের ব্যাপক অবদানকে অস্বীকার করেননি। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে অনেকে মৌখিক সংস্কৃতি বলে থাকেন। কিন্তু লোকসংস্কৃতির এমন উপাদান আছে যেগুলি মুখে মুখে শুনে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে দেখে দেখে আয়ত্ত করতে হয়। যেমন- গ্রাম্য ঘরবাড়ি, হাতিয়ার, লাঙল, জোয়াল, নিত্য ব্যবহার্য নানারকম উপকরণ, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকক্রীড়া, নক্সা প্রভৃতি। আবার লোকসংস্কৃতির এমন অনেক উপাদান আছে যেগুলির লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি লাভ করেছে। যেমন - চেইন লেটার্স, অটোগ্রাফ, ঐতিহ্যমুখী পত্র প্রভৃতি। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে আমরা এমন কতকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি যে-বিষয়গুলির প্রত্যেকটি লোকসংস্কৃতির এক একটি বিশিষ্ট অংশ লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই উপাদানগুলির মধ্যে নিহিত

আছে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়। বিষয়গুলো মূলতঃ লোককাহিনী জাত-পৌরাণিক লোককাহিনী *(Myths)*, উপকথা বা উপদেশাত্মক লোককাহিনী (*Fables)*, প্রানীবাচক লোককাহিনী (*Animal Tales)*, সাংসারিক লোককাহিনী *(Household Tales)*, কৌতুকময় লোককাহিনী *(Humorous Tales)*, কিংবদন্তী*(Legends)*, লোকগল্প*(Folk Stories)*, রূপকথা*(Fairy Tales)*, ইত্যাদি। এছাড়া প্রবাদ*(Proverbs)*, ধাঁধা*(Riddles)*, লোকসঙ্গীত*(folk songs)*,লোকগীতিকা *(Ballads)* লোকবিশ্বাস, *(Folk Beliefs)*,লোকাচার *(Customs)*, কুসংস্কার বা লোকসংস্কার*(Folk Superstitions)*, লোক উৎসব *(Folk Festivals)*, লোক নাট্য *(Folk Dramas)*,লোকছড়া *(Folk Rhymes)*, লোক মন্ত্র *(Folk Chants)*, লোকআর্শিবাদ *(Folk Blessings)*, লোকউপমা *(Folk Similies)*, লোকনাম *(Folk Names)*, লোকবিদ্যা *(Folk Education)*, লোকবক্তৃতা *(Folk Speeches)*, লোকনৃত্য *(Folk dances)*, লোকঔষধ *(Folk Medicines)*, লোকক্রীড়া *(Folk Games)*, লোকপরিচ্ছদ *(Folk Costumes)*, লোকঅলংকার *(Folk Ornaments)*, লোকভঙ্গি*(Folk Gestures)*, লোকখাদ্য *(Folk Foods)*, প্রভৃতি। বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। পর্যায়গুলি নিম্নরূপ—

১. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ-

পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে অশিক্ষিত কারিগরগণ যে সমস্ত বস্তুসামগ্রী উদ্ভাবন করে বা সৃষ্টি করে সেগুলি দেশের সমস্ত সমাজের সামগ্রী হয় ওঠে। এই সমস্ত বস্তু সামগ্রীকে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত করা যায়। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি হল- ঘর, বাড়ি, বেড়া, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, লোকযান, লোকবাহন (গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি বা কুকুরে টানা গাড়ি), আসবাবপত্র, লোকখাদ্য প্রভৃতি।

এই উপাদানগুলি পুরুষানুক্রমে সমাজের একজনের কাছ থেকে সমগ্র সমাজে বা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপাদানগুলির কোনো কোনোটি মুখে মুখে শুনে প্রচারিত হয়, কোনোটি দেখে শিখে নিতে হয়, কোনোটি বা অনুকরণের মাধ্যমে শিখে নিতে হয়।

২. বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ-

এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি মুখে মুখে সৃষ্টিলাভ করে ঐতিহ্য পরম্পরায় মুখে মুখেই বাহিত হয়ে চলেছে, এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"Folk literature is simply literature transmitted orally."[২৪]

এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল- লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, লোকগীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া হেঁয়ালি, ধাঁধা প্রভৃতি। তবে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে লিখন পদ্ধতি আবিস্কার হবার পর লোকসংস্কৃতির অনেক মৌখিক উপাদান লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে লোককাহিনী, প্রবাদ, হেঁয়ালি বা ছড়ার কথা বলা যেতে পারে। অবার লিখিত সাহিত্যের অনেক অংশ মৌখিক সাহিত্যে প্রবেশ করে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ওডিসি, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতিপ্রাচীন গ্রন্থের অনেক কাহিনী মৌখিক ঐতিহ্য থেকেগ্রহণ করা হয়েছে। তাই তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, লিখিত সাহিত্যের নিকট মৌখিক সাহিত্য যতটা ঋনী, মৌখিক সাহিত্যের নিকট লিখিত সাহিত্য তদপেক্ষা অনেক বেশি ঋণী।

৩. **অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ-**

এই পর্যায়ের উপাদানগুলিকে শিল্প বা সাহিত্য কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির উপাদান বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল- নক্সা, আলপনা, দেয়ালচিত্র প্রভৃতি। তবে কোনো শিল্পী যখন নক্সা, আলপনা বা দেয়ালচিত্র অঙ্কন করেন, তখন ছবির সৌন্দর্য কে যেমন অস্বীকার করা যায় না , তেমনি পাত্র বা দেওয়ালকে ছবি থেকে আলাদা করা যায় না। আর এই সৌন্দর্য বোধের কারণে এই উপাদানগুলিকে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান বলা যাবে না। কোনো পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াই একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত শিল্পী যখন কাঁথা, ফুলদানি বা টুপিতে নক্সা অঙ্কন করেন, উঠানে বা সিঁড়িতে আলপনা আঁকেন, বাড়ি বা মন্দিরের দেওয়ালে নানারকম চিত্র অঙ্কন করেন তা দেখে আমাদের মন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যলোকে পাড়ি দেয়। তখন এই উপাদানগুলি আর নিছক বস্তু থাকে না, বস্তুর অতীত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অঙ্কন কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান হয়ে ওঠে।

৪. **বিশ্বাস-সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ-**

বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার পূজাপার্বন বা সংস্কার মূলক কার্যকলাপ থেকে এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি উদ্ভূত হয়। এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল- লোকাচার, লোকসংস্কার,লোকউৎসব, লোকপার্বন, লোকপূজা, গাছে-গাছে বিবাহ বা গাছে-মানুষে বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে যে, এমন অনেক লোকবিশ্বাস আছে যেগুলি শুধু মাত্র মনে প্রাণে বিশ্বাসই করা হয় না, বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ ও করা হয়। এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি মূলতঃ অনুকরণের মাধ্যমে পুরষানুক্রমে প্রচারলাভ করে। তবে অনেক উপাদান আবার মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শুনে শুনে পালন করতে শেখে।

৫. **খেলাধূলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি ঃ-**

নিজেদের শরীরচর্চার জন্য সর্বোপরি আত্মআনন্দ উপলব্ধির জন্য অশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনসাধারণ সাধারণত খেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি করে থাকে। কোনো কোনো খেলাকে অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক মনে হলেও আসলে তা বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ। এমনকি অনেক সুসভ্য সমাজের নিয়মতান্ত্রিক খেলাধূলা থেকে এই সমস্ত খেলার জন্ম হয়েছে। এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল- হাডুডু, ডাংগুলি, নোন্তা, নৌকাবাইচ, কানামাছি, ষাড়ের লড়াই প্রভৃতি। এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি দেখে দেখে কিংবা অনুশীলনের মাধ্যমে শিখে নিতে হয়।

৬. **অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ-**

এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। পুরুষাণুক্রমে এই উপাদানগুলি দেখে দেখে অনুকরনের মাধ্যমে কালোত্তীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই পর্যায়ের কোনো কোনো উপাদান আবার মুখে মুখে শুনেও প্রচারলাভ করেছে। বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সৃষ্ট এই পর্যায়ের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল- লোকনৃত্য, লোকভঙ্গি, লোকাভিনয় প্রভৃতি।

আলোচ্য লোকসংস্কৃতির পর্যায়গুলো ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ এর বিভিন্ন পালায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিভাজন করে লোকসংস্কৃতির সার্বিক দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল—

(১) বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ—

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' প্রথম খন্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় মহুয়া নদ্যার চাঁদকে মহিষের দই, সাইল্যা ধানের চিঁড়া ও সবরি কলা খেতে দিয়েছে। আবার 'আয়না বিবির পালায' আয়না বিবি তার স্বামীকে বিন্নি ধানের খই এবং মহিষের দই খেতে দিয়েছে। এইসমস্ত খাদ্যদ্রব্য আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় চাঁদবিনোদ শিকারে যাবার আগে মলুয়াদের বাড়িতে অতিথি হয়ে গেলে তাকে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হয়েছিল তা আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত—

"মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
রুইমাছের সুরুয়া রান্ধে জিরার সম্ভার।।
কাইট্যা লইছে কইমাছ চড়বড়ি খারা।
ভালা কইর‍্যা রান্ধে বেনুন দিয়া কাইল্যা জিরা''।।[২৫]

'বাইদ্যা কন্যা মাহুয়া' পালায় বেদের দলের অন্যতম খেলোয়াড় সুজন, মহুয়াকে হাতের মালা দেওয়ার কথা বলেছে। নদ্যার চাঁদকে বাঁচানোর আশায় মহুয়া যখন সাধুর নৌকায় ওঠে, তখন দুশ্চরিত্র সাধু মহুয়াকে নীলাম্বরী শাড়ি, উদয়তারা শাড়ী, শাঁখা, চন্দ্রহার, নথ ও নুপুর দিয়ে নিজের বশে আনার চেষ্টা করেছে, 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় লুচ্চা কাজী মহুয়াকে পাওয়ার জন্য সোনার পালঙ্ক, সাজুয়া বিছানা, মোহরের হার, নাকের নথ দেওয়ার কথা বলেছে। এই পালায় সাধু আয়না বিবির জন্য আশমানতারা শাড়ী আনার কথা বলেছিলেন। উপরোক্ত এই সমস্ত অলংকার ও পোষাক পরিচ্ছেদ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় নদ্যার চাঁদের বাঁশি মহুয়ার দেহমন হরন করে নেয়। 'সুন্দরী মলুয়া ' পালায় মনসার মন্দিরে ঢাক ঢোল বাজে। 'দস্যু কেনা-রামের পালায়' কেনা রাম মৃদঙ্গ বাজাত। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

দ্বিতীয় খন্ডের 'রাজকন্যা রূপবতী পালায় ' লোকখাদ্য হিসেবে বিন্নিধানের খই, সাইল্যা ধানের চিড়া, কাতলা মাছ,ইলিশ মাছ প্রভৃতি মাছের উল্লেখ আছে। 'আয়না বিবি ও নছর মালুম' পালায় আম, কাঠাল, নারকেল ইত্যাদি ফলের উল্লেখ আছে। 'মনির ওঝা মঞ্জুর মাও' পালায় মঞ্জুর মাও হাছেনকে চিড়া, পিঠা ইত্যাদি দিয়েছে। এইসমস্ত খাদ্য দ্রব্য আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'কাঞ্চন কন্যার পালায়' তমসা গাজী, কন্যার জন্য মোতির মালা, কোমরের ঘুঙুর, নাকের নোলক ইত্যাদি অলংকার এনেছে, 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় হাতের বালা, কানের গহনা, ও নাকের নথের প্রসঙ্গ আছে। এই সমস্ত অলংকার আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় তমসা গাজী কন্যার জন্য অগ্নিপাটের শাড়ি এনেছে। 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় লোকপোষাক হিসেবে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত নানা পোষাকের উল্লেখ আছে—

"পইরনেতে তহমান কালা কূর্তা গায়।
মাথার উপর টুপি দিয়া আয়না ধরি চায়।।''[২৬]

'পীর বাতাসী কন্যার' পালায় বিনাথ নলি বাঁশ কেটে বাঁশি বানায়। 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় ঢাক ঢোল বাজানোর দৃশ্য আছে। 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় এবং 'দেওয়ান মদিনা' পালায়, ঢাক, ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে ।এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

তৃতীয় খন্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় লীলাকন্যা কঙ্ককে সাইল্যা ধানের চিড়া ও দই খেতে দেওয়ার কথা বলেছে। 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালায়' ভেলুয়া সুন্দরী আমির সাধুকে খেজুর, কিচমিচ, বাদাম,

গরুর দুধ ইত্যাদি খেতে দিয়েছে। 'কমলা কন্যার পালায়' তালের পিঠা, চিঁড়া, খিঁচুড়ি, পায়েস ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় মুরারী চন্ডাল, কঙ্ককে রূপার খাড়ু , রূপার বালা, গলায় পদকমনি পরিয়ে দিয়েছে। 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালায়' ভেলুয়ার সাত ভাই এর বউ ভেলুয়াকে নাকে নথ, সোনার কঙ্কন, বাজুবন্ধ, গলায় হাসুলি ও নাকে নথ পরিয়ে দিয়েছে। 'কমলা কন্যার পালায়' কমলাকে কানে ঝুমকো দুল, নাকে নথ, গলায় হীরার হাঁসুলি, হাতে সোনার বাজু, মস্তকে সিঁথি পাটি ইত্যাদি অলংকার পরতে দেখা যায়। 'সুনাই সুন্দরী' পালায় পায়ের মল, হাতের বাজুবন্ধ, গলায় হীরামতির হার ইত্যাদি অলংকারের কথা আছে। 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালায় রাজকন্যা বাজুবন্ধ, হীরামতির হার ইত্যাদি অলংকার পরত। এই সমস্ত অলংকার আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালায়' আমির সাধু মাথায় টুপি, চিকন ধুতি, কাশ্মীরী জামা, চীনার জুতা পরেছে। 'কমলা কন্যার পালায়' কমলার বিবাহের সময় কমলা আশমান তারা শাড়ি পরেছে। 'সুনাই সুন্দরী' পালায় সুনাই এর মামা সুনাইকে নীলাম্বরী শাড়ি দিয়েছে। 'শীলাদেবীর পালায়' মেঘডম্বুর শাড়ি, ও নীলাম্বরী শাড়ির প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। এই সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় কঙ্কের বাঁশি শুনে বনের পশু হিংস্রতা ভুলে যায়। 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালায়' মাঝিমাল্লাদের শিঙ্গা বাজাতে শোনা যায় এবং আমির সাধুকে সারিন্দা বাজাতে দেখা যায়। 'কমলা কন্যার পালায়' ঢাক-ঢোল বাজানোর কথা আছে। 'শীলাদেবীর পালায়' ও নানা ব্যদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—

'নানান জাতি বাজুনীয়ার ঢুলির বাদ্যি বাজে।'
"জয়ডঙ্কা কান্ধে আইল বিন্নির মুড়ি লইয়া।''
"খড়কর তাগির সঙ্গে শুনি জয়ঢাকের ধ্বনি।।'' [২৭]

উপরোক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' চতুর্থ খন্ডের 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় লোকখাদ্য হিসাবে খিচুড়ি, রুইমাছ, ইলিশমাছ, মহিষের দুধ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। 'মানিক তারা ডাকাইত' পালায় কানুর মা, বাসুর মাকে বেল সহ নানারকম ফল ও মহিষের দুধ খেতে দিয়েছে। মানিকতারা বাসুদের বাড়িতে গেলে বাসুর মা তাকে যে সমস্ত খাদ্য খেতে দিয়েছে তা বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত—

"গুড় বাতাসা দিল আইনা আর চিঁড়ার মোয়া।
পাক্কা ডউয়া ভাইঙ্গাঁ দিল মস্ত মস্ত কোয়া।।
তিলের নাড়ু নাইরকল নাড়ু আর পাকা কলা।
একবাটি দই দিল তাতে চিনির দলা।।'' [২৮]

'নেজাম ডাকাইতের পালায়' কামিজ, কুর্তা, শাল ইত্যাদি পোষাকের উল্লেখ আছে। 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় সোনার জরির কাজ করা চাদর ও ধুতির উল্লেখ আছে। এই সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় বাসু ডাকাত সোনার বেসর, গলার চিক, সোনার হাঁসুলি, মুক্তামালা, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলংকার চুরি করে এনে তার মাকে দিয়েছিল। 'শান্তি কন্যার হাঁহলা' পালায় শান্তি কন্যার বিবাহে মোতির মালা, গলার হাঁসুলি, হাতের বাজুবন্ধ, পায়ের নুপুর ইত্যাদি অলংকার দানের কথা আছে। এই সমস্ত অলংকার আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় লোকবাদ্য হিসাবে জয়ঢাক, কাড়া, কাঁসি, খঞ্জনী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। 'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালায়' বাঁশি, ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত।

পঞ্চম খন্ডের 'পরীবানু বেগমের পালায়' পার্বত্য মুরুঙ্গ্যা জাতি গোস্ত বা গোমাংস ভক্ষন করে। 'কবরের

কান্না' পালায় নুরুন্নিছার মা মালেককে তরমুজ, বাকি বা ফুটি, মহিষের দুধ ও দই, কুশ্যালের মিডা বা আখের গুড়, চিংড়িমাছ, পিঠা ইত্যাদি খেতে দিত। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা নিপুণভাবে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত বিভিন্ন লোকখাদ্যের বর্ণনা দিয়েছেন —

"নুরুন্নিছা মাও মালেকর নিত ঘরে ডাকি।
আদর করি খাওয়াই দিত তরমুজ ক্ষিরা বাকি।।
মৈষর দই দিত আর কুশ্যালের মিডা।
দুধের সঙ্গে মিশাই দিত পাক্কনের পিডা।।[২৯]

'কমল সদাইগরের পালায় ' অগ্নিপাটের শাড়ি, 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবির পালায়' আশমান তারা শাড়ি, 'পরীবানু বেগমের পালায়' জরির শাড়ি, 'ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী' পালায় পাটের শাড়ি পরিধানের কথা আছে। এই সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ্ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'কমল সদাইগরের পালায়' গলার হার, 'আন্ধাবন্ধুর পালায়' মণি মানিক্যের মালা, নুপুর, 'পরীবানু বেগমের পালায়' নাকের নথ, সোনার হার, 'ছুরত জামাল-অধূয়া সুন্দরী' পালায় হীরার অঙ্গুরী, 'কবরের কান্না পালায়' রূপার খাড়ি সহ নানা অলংকারের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত অলংকার আসলে বস্তু কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'কমলসদাইগরের পালায়' নাগরা, 'আন্ধাবন্ধুর পালায়' বাঁশি, ঢোল, 'কবরের কান্না, পালায় শিঙ্গা, নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত লোকবাদ্য আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

ষষ্ঠ খন্ডের 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালায়' বাইন্যা বউ নিজে মুড়ি, চিঁড়া, খই, ডালবড়া, নারকেল নাড়ু, মোরব্বা ইত্যাদি খাবার তৈরী করেছে। এছাড়া বাইন্যা বউ ডাল, সুক্তা, কুমড়ার তরকারী, রুইমাছ, ইলিশমাছ, বোয়াল মাছ, বেলে মাছের অম্বল, কইমাছ ইত্যাদি খাদ্যবস্তু রান্না করেছে। 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীর, সর, ননী খাওয়ার কথা আছে। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। 'হাতি খেদার গান পালায়' খামি বা লুঙ্গি এবং ধাইয়া বা গামছা ব্যবহারের কথা আছে। এই পোষাক পরিচ্ছদ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালায়' মদন ভেলুয়া সুন্দরীর হাতে মনিমুক্তা খচিত আংটি পরিয়ে দিয়েছে। 'মলয়া কন্যার পালায়' মলয়া কন্যার গলায় মোতির মালা পরতে দেখা যায়। 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় নানা অলংকারে ভূষিত গোপালের বর্ণনা দিতে গিয়ে পালা রচয়িতা বলেছেন -

"কর্ণেতে কুন্ডল দিল নয়ানে কাজল।
কটিতে কিঙ্কিনী দিল পীতাম্বর গায়।।
সুবর্ণের খাড়ু দিল কৃষ্ণের দুই করে।
গলায় বান্ধিয়া দিল সুবর্ণের পাটা।''[৩০]

উপরোক্ত বিভিন্ন পালায় ব্যবহৃত নানারকম অলংকার আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'কুমার বীর নারায়ন' পালায় বাঁশি, 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালায়' দামামা, 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পালায় শিঙ্গা বাজানোর উল্লেখ আছে। এই সমস্ত লোকবাদ্য আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

সপ্তম খন্ডের 'দেওয়ান ইশা খাঁর পালায়' লোকখাদ্য হিসাবে গোরুর মাংস ও ভেড়ার মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে যা বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'সন্নমালার পালায়' গলার হার, 'চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ন পালায়' গজমতির হার, রামলক্ষ্মন শাঁখা, ইত্যাদি অলংকারের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত অলংকার বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'রতন ঠাকুরের পালায়' অগ্নিপাটের শাড়ি, 'দেওয়ান ইশা খাঁর পালায়' ইরানের শাড়ি ইত্যাদি পোষাকের উল্লেখ আছে। 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ন পালায়' পালা রচয়িতা নানা রকম শাড়ির উল্লেখ করেছেন

"গঙ্গাজলী শাড়ী পরে গো পিন্ধনে বাহার।
কোমর বেড়িয়া পরে গো পাটের পসার।।" [৩১]

উপরোক্ত লোক পোষাক পরিচ্ছদ্ আসলে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

(২) বাক্‌কেন্দ্রিক্ লোকসংস্কৃতি ঃ—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' প্রথম খন্ডের পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালাটিকে সমালোচকগন আদর্শ গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন। এই পালার নায়ক নদ্যার চাঁদ, বেদের দলের সঙ্গে মহুয়াকে দেখে অভিভূত ও পুলকিত হয়ে বলেছিল —

"গোবর গাদায় পদ্মফুল, কানার পদ্মলোচন নাম"। [৩২]

মহুয়ার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় বাক্‌কেন্দ্রিক্ লোক সংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত এই প্রবাদ প্রবচনটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বেশ প্রচলিত। এই পালার অন্যত্র মহুয়ার সখী পালংসই মহুয়াকে বলেছে —

"আশমানেতে হাত বাড়াইছ কইর‍্যা চাঁদের আশা।" [৩৩]

পালং সই আলোচ্য প্রবাদ প্রবচনটির মাধ্যমে মহুয়াকে বোঝাতে চেয়েছে যে আশমানের চাঁদ যেমন অধরা, তেমনি নদ্যার চাঁদকে পাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। আবার এই পালায় হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে বামন কান্দা গ্রামে নদ্যার চাঁদের বাড়িতে গান করছে, মহুয়া বনের ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছে। 'সুন্দরী মলুয়া পালা'য় চাঁদ বিনোদ মাঠে যেতে যেতে বারোমাসী গান গাইছে। এই বারোমাসী গান আসলে ভাটিয়ালি লোকসঙ্গীত। 'চন্দ্রাবতী পালায়' আমরা দেখতে পাই চন্দ্রাবতীর বিবাহের সময় সমস্ত নারী মিলে বিয়ের গান গাইছে। উপরোক্ত সমস্ত লোক সঙ্গীত আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় গভীর অরণ্যে জ্ঞানহীন মৃতপ্রায় নদ্যার চাঁদকে এক সন্ন্যাসী মন্ত্রোচ্চারণ করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। 'সুন্দরী মলুয়া পালায়' সর্পদংশনে চাঁদবিনোদের মৃত্যু হলে এক ওঝা মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। এই সাধু ও ওঝার মন্ত্রোচ্চারণ আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

দ্বিতীয় খন্ডের 'কাঞ্চন কন্যা পালায়' রাজকুমার, ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালাকে প্রেম নিবেদন করলে কাঞ্চন কন্যা প্রথমে সাড়া না দিয়ে নিজেকে সংযত রেখে বলেছে —

"বামুন হইয়া আমি
কেনে চান্দে বাড়াই হাত।" [৩৪]

বাক্‌কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত এই প্রবাদটি বাস্তবে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো ঠিক নয় - রূপে ব্যবহারিক জীবনে বহুল প্রচলিত। আবার 'কমলা রানীর পালায়' দেখানো হয়েছে যে, দেওয়ানের সঙ্গে বিরোধ করে বাঁচা অনেকটা জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করার সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত প্রবাদটি হল —

"দেওয়ানের সঙ্গে বিরূধ কইর‍্যা বাঁচন না যায়।
জলে থাইক্যা কুম্ভীরের সঙ্গে বিরূধ না জুয়ায়।" [৩৫]

'সদাগর কন্যা বগুলা' পালায় বগুলা তার বাল্য সহপাঠী অপর এক সদাগর পুত্রকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এক প্রভাবশালী রাজকুমার বগুলাকে বিবাহ করতে চাইলে বগুলা ব্রত অনুষ্ঠানের ছুতা দেখিয়ে বিবাহের কালকে তরান্বিত করবার জন্য রাজকুমারের বিবাহের প্রস্তাবকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছে —

"কালপূর্ণ হইতে রে কুমার আর পঞ্চমাস বাকি।
সবুরে ফলিব মেওয়া আশার আশে থাকি।'' [৩৬]

'সদাগর কন্যা বগুলার' কণ্ঠে উচ্চারিত এই চিরাচরিত লোকপ্রবাদটি বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায় নায়ক নছর, আমিনা বিবির সঙ্গে যে অমানবিক ব্যবহার করেছে সেজন্য তাকে ফলভোগ করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত কবি নছরের উদ্দেশ্যে যেকথা বলেছেন তা বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ —

"কাউয়ার বাসাত কোকিলের ছাও ন মানিল পোষ।
ঘরবাড়ি ছাড়িল নছর নছিবের দোষ।'' [৩৭]

মনসুর বয়াতি রচিত 'আলাল দুলালের পালায়' নৌকার মাঝিরা বৈঠার তালে তালে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সারিগান গাইত। আবার আলাল একটি বটতলায় বিশ্রাম নেবার সময় রাখালদের কণ্ঠে লোক সঙ্গীত শুনতে পায়। উপরোক্ত এই সমস্ত লোকসঙ্গীত আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। অন্যদিকে রজনী গোপাল রচিত 'পীর বাতাসী কন্যার পালায়' সুমাই ওঝা মন্ত্রের প্রভাবে বনের সাপ ধরে আনে। সুমাই ওঝা তার গুরুর কাছ থেকে সাপধরা মন্ত্র, সাপের বিষ তাড়ানো মন্ত্র, সাপকে বশ করা মন্ত্র, বাসুকীর মাথা নোয়ানো মন্ত্র ইত্যাদি করায়ত্ত করেছে। এই সমস্ত মন্ত্র আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'কাঞ্চন কন্যা পালায়' গাজী বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসে তার স্ত্রীর কাছে যে কথা বলেছে তা আসলে একটি ধাঁধা। আর এই ধাঁধা ও বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত -

"এক দেশ দেইখা আইলাম উলু ছনের ছানি।
আর এক দেশ দেইখা আইলাম গাছের আগায় পানি।'' [৩৮]

তৃতীয় খন্ডের প্রথম পালা 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় কঙ্ক শৈশবে মাতা পিতার মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কৃপায় এক চন্ডালের গৃহে অসহায়ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে পালা রচয়িতা বাককেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত এই প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন -

''রাখে কৃষ্ণ মারে কে কয় সর্বজন।
সেইত ঘটনা হইল শুন সভাজন।।'' [৩৯]

'কমলা কন্যার পালায়' দ্বিজ ঈশান দেখিয়েছেন, কমলাকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে কমলা চিকন্ গোয়ালিনীকে শূলে দেওয়ার কথা বলেছেন। এ সময় দ্বিজ ঈশান কমলার মুখ দিয়ে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি উপযুক্ত প্রবাদ প্রবচন উচ্চারণ করিয়েছেন -

''ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।।'' [৪০]

'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালায়' কঙ্কের কণ্ঠে যে বারোমাসী গান ও ভাটিয়ালী গান শোনা যায় তা আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। এই পালার অন্যত্র আমরা দেখতে পাই এক পীর মন্ত্র পুতঃ ধূলা পড়া দিয়ে সকলের রোগ সারাচ্ছে। আবার 'ভেলুয়া সুন্দরী আমির সাধু' পালায় ভেলুয়া সুন্দরীর বিবাহের সময় আমরা মঙ্গল প্রার্থনা মন্ত্র শুনতে পাই। এই খন্ডের 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালায় সিঙ্গি রাজা ও ভারইয়া রাজার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধলে ভারইয়া রাজা মন্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধের গতিকে তরান্বিত করেন। উপরোক্ত বিভিন্ন পালায় আমরা যে মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পাই এই সমস্ত মন্ত্র আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খন্ডের প্রথম পালা 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় রামগতি, রঙ্গমালা সম্পর্কে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ উচ্চারণ করেছে —

"ট্যাকা হইলে বাঘের চৌগ বাজারে কিনন্ যায়।" [৪১]

এই পালার অন্যত্র খঞ্জনি হাতে এক বোষ্টমীর কণ্ঠে আমরা লোকগান শুনতে পাই। আবার 'মানিকতারা ডাকাইত পালা' রচনার সময় বিবাহ বাসরে গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল —

"বিয়ার রাইতে তিন বউ আর পাড়ার যত মাইয়া।
মনের মতন কইরল আমোদ বিয়ার গান গাইয়া।।" [৪২]

উপরোক্ত এই সমস্ত লোক সঙ্গীত আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 'রঙ্গমালা সুন্দরী পালায়' বোষ্টমী শ্যামপ্রিয়া মন্ত্র পড়া পান খাইয়ে রঙ্গমালাকে বশ করতে চেয়েছে। কিন্তু বোষ্টমীর পান পড়া ব্যর্থ হলে, রাজচন্দ্র মন্ত্রপুত পান রঙ্গমালাকে খাওয়ালে রঙ্গমালার মন উচাটন হয়ে ওঠে। এই সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণ আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত —

"জয়কালীর নাম লই রাজচন্দর মন্তর পড়িতে লাগিল।
এক ফুক দুই ফুক তিন ফুক দিল।।" [৪৩]

পঞ্চম খন্ডের প্রথম পালা 'কমল সদাইগরের পালায়' রানী সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর পর কমল সদাইগর অত্যন্ত দুঃখ পায়। এ সময় পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বললে কমল সদাইগর তাতে রাজী হয়নি। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন —

"মানুষের মন্‌রে জাইন্য কচুপাতায় জল।
লড়াচড়া খাইলে ভাইরে করে টলমল।।" [৪৪]

এই 'কমল সদাইগরের পালায়' বাড়ির প্রধান দাসী মইফুলার কণ্ঠে আমরা বারোমাসী গান শুনতে পাই। 'কবরের কান্না পালায়' নৌকার মাঝি মাল্লাদের কণ্ঠে আমরা সারিগান ও ধূয়া শুনতে পাই। এই সমস্ত লোকগান আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। কমল সদাইগরের পালায় দক্ষিন দেশে পাহাড়ী মুল্লুকে রাজা মারা গেলে কে রাজা হবে সেই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা একটি বাস্তব লৌকিক ছড়া ব্যবহার করেছেন —

"সোনা রূপা নষ্ট জাইন্য তামা আর পিতলে।
রাজা নষ্ট অবিচারে, মধু নষ্ট জলে।।" [৪৫]

এই লৌকিক ছড়াটি আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবির পালায়' ফিরোজ খাঁ ফকিরের বেশে দেওয়ানের বাড়িতে এসে তাকে মন্ত্রপুত তাবিজ দিয়েছে এবং নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করে ঝাড়ফুক করেছে। এই সমস্ত মন্ত্র আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৬ষ্ঠ খন্ডের প্রথম পালা 'কুমার বীর নারায়নের পালায়' বীরনারায়ন সোনাকে নিয়ে গভীর অরণ্যে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু জমিদারের লোকজন বীরনারায়নকে গভীর অরন্যে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে আসে। সোনা কন্যা একা বনে থেকে গেল। এই অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাত কবি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন —

"এমুন সুখের বনে হায়রে কি কাম হইল।
বিনা মেঘে ঠাডার আইসা মস্তকে পড়িল।।" [৪৬]

'কুমার বীরনারায়ন পালায়' বীরনারায়ন সোনা কন্যার মাথার চুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া ব্যবহার করেছেন —

"কাউয়া কালা কোইলা কালা
চৌখের কাজল কালা বেশ।
তার থিক্যা অধিক কালা
কইন্যা তোমার চাচর কেশ।।" [৪৭]

অন্যদিকে 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালা'য় নন্দরানী গোপালকে গোষ্ঠে পাঠানোর আগে তার মাথায় মন্ত্রপুত মোহন চুড়া বেঁধে দেন। গোপালকে সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য নন্দরানীর এই যে মন্ত্রোচ্চারণ তা আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ —

"মন্ত্র পড়ি চূড়া বান্ধে ময়ূর পাখা দিয়া।
বান্ধিল মোহন চূড়া বামে হেলাইয়া।" [৪৮]

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' সপ্তম খন্ড তথা শেষ খন্ডের 'দেওয়ান ইশাখাঁর পালায়' পশ্চিম মহলের রাজা ধনপত সিং হজ করে ফেরার পথে দিল্লীর নবাব গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলে, নবাব তাকে বিশেষভাবে আতিথেয়তা করলেন। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি বহুপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেছেন —

"বড়োর মান বড়োয় জানে অন্যে জাইনব কি।
কুত্তায় না জানে ভাইরে কিবান চিজ্ ঘি।" [৪৯]

আবার এই পালায় দেওয়ান ইশা খাঁর মৃত্যুর পর অজ্ঞাত পালা রচয়িতা মরণকালে কেউ যে কারুর সাথী হয় না, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত একটি সুন্দর ছড়া ব্যবহার করেছেন —

"স্তিরী বল পুত্র বল গর্ভসোদর ভাই।
আইন্যা দিলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই।" [৫০]

শেষখন্ডের শেষ পালা 'একালের গান - বাল্যস্থতি স্মরণে উদ্‌বাস্তুর কান্না' পালায় নয়ান মাঝি কার্তিক মাসের ভোরবেলায় প্রভাতী গান গায়, বাড়ির মহিলারা মনের সুখে লক্ষ্মী পূজার গান গায় - এই সমস্ত গান আসলে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত। আবার 'হরিণ কুমার জিরালনী কন্যার পালা'য় বিমাতার চক্রান্তে হরিণকুমারকে বনবাসী হতে হয়। বিমাতা চক্রান্ত করে হরিণ কুমারের হাতে মন্ত্রপুত কবচ বেঁধে দিয়ে সতীন পুত্রকে হরণ করে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। আবার রাজা দন্ডপতিকে মন্ত্রবলে বশ করে নেয়। আবার অন্যত্র 'সন্নমালার পালায়' রাজার হুকুমে সাধুর পুত্র সর্পদংশনে মারা গেলে , এক জেলে সন্নমালাকে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা করার মন্ত্র শিখিয়ে দেয়। এই রক্ষা মন্ত্র শিখে সন্নমালা সাধুর পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলে। উপরোক্ত এই সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণ আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

(৩) অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ—

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' প্রথম খন্ডের প্রথম পালা 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় মহুয়া লতাপাতা, ঘাস, পাখির পালক ইত্যাদি দিয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য বানিয়ে তার উপর নানা রকম রঙ করতেন। প্রথম খন্ডের 'শ্যামরায়ের পালা' এবং তৃতীয় খন্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায়

জীবিকা নির্বাহের জন্য ডোম নারীরা কারুকার্য খচিত বিউনি বা পাখা বানাত। আবার চতুর্থ খন্ডের 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় শ্যামপ্রিয়ার হাতে নানা বর্ণের কাঁথা দিয়ে প্রস্তুত ঝোলা দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা সুন্দরভাবে তার বিবরণ দিয়েছেন –

"হেকমত্যা শ্যামপ্রিয়া হেকমত করিল।
জুম্বুলরতুন খুঞ্জুনিডা টানি হাতত রইল।" [৫১]

আবার 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় রং-বেরং এর আলপনা আঁকা সুসজ্জিত রঙিন প্রমোদ তরী দেখতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত শিল্প দ্রব্যের উপর রং করা, পাখার উপর নানা রকম আলপনা আঁকা, নানা রঙের কাপড় জুড়ে তৈরী কাঁথা বা নৌকার গায়ে নানা রঙিন চিত্র অংকন - সমস্তই অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

(৪) বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ—

প্রথম খন্ডের 'সুন্দরী মলুয়া' পালার অন্তর্গত চরিত্র চাঁদ বিনোদের বিবাহের পূর্বে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী নান্দীমুখ অনুষ্ঠানের পরিচয় মেলে। এই সময় পাড়ার নারীরা পাত্র পাত্রীর বিবাহিত জীবনের শুভ কামনা করে জয়ধ্বনি ও করে। 'চন্দ্রাবতী' পালায় আমরা দেখতে পাই বিবাহাদি বা যেকোনো শুভকর্মের আলোচনা উপলক্ষে পানের খিলি প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। আবার 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় আমরা দেখতে পাই মহুয়া ও তার পালক পিতা হুমরা বেদে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সংসারের মঙ্গল কামনায় দক্ষিন দুয়ারি ঘর তৈরী করে। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী মহুয়া ও নদ্যার চাঁদের মৃত্যুর পর হুমরাবেদে তাদেরকে একস্থানে কবর দিয়েছে। 'দস্যু কেনারামের পালায়' মানুষ বিশ্বাস করে যে শিব ও কালির প্রতি মতি থাকলে কোনো দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায়, পালা রচয়িতা দ্বিজ কানাই সমসাময়িক লোকবিশ্বাসকে মূল্য দিয়ে মানুষেরা পুত্র কামনায় যে কার্তিক ব্রত পালন করেন তার উল্লেখ করেছেন—

"কার্তিক মাসে কাত্তিক বরত্ পুত্রের লাগিয়া।
আঙ্খি ঘোর হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া।" [৫২]

তবে উপরোক্ত সমস্ত লোক বিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' দ্বিতীয় খন্ডের 'কাঞ্চন কন্যা' পালায় লোক বিশ্বাস ও লোকাচার অনুযায়ী পাড়াপড়শিরা যে বিবাহাদি শুভকর্মের সময় জয়ধ্বনি করত, অজ্ঞাত পালা রচয়িতা তার উল্লেখ করেছেন। আবার 'কমলা রানীর পালায়' সমাজের মঙ্গল কামনায় কোচ জাতির মানুষেরা কামাক্ষা দেবীর পূজায় পাঁঠা বলি দিত, মহিষ বলি দিত এমনকি মানুষ বলিও দিত। আবার 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় কাঙ্গালিয়ার মৃত্যুর পর তার আত্মার শান্তি কামনায় লোকবিশ্বাস ও লোকাচার অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরিচয় মেলে। আবার 'সদাগর কন্যা বগুলা' বা 'বগুলার বারোমাসী' পালায় গৃহে নতুন ধান উঠলে নারীরা লোকাচার ও বিশ্বাস বশতঃ কিভাবে লক্ষ্মীদেবী আরাধনা করে, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অজ্ঞাত পালা রচয়িতা বলেছেন—

"ঘরে আইয়ে নয়াধান জয়াদি জুকারে
অর্ঘ্য দেয় কুলের নারী ঘরের লক্ষ্মীরে" [৫৩]

'আয়না বিবি ও নছর মালুম' পালায় আমরা দেখতে পাই যে কোনো শুভকর্ম বিষয়ক আলোচনান্তে পানের খিলি প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত এই সমস্ত লোকাচার ও লোকবিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় খন্ডের 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' পালায় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ নারায়ণ, দুর্গা গণপতি, সরস্বতী

ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা অর্চনা করত। এই পালায় অন্যত্র গর্গের উক্তিতে জীবনের শেষ শান্তির ঠিকানা যে শ্রীগৌরঙ্গের চরণ, তা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু গর্গ নয় বিশ্বচরাচরের ঈশ্বর প্রেমী মানুষ মাত্রই একথা বিশ্বাস করে। 'কমলা কন্যার পালার' বন্দনা অংশে পালা রচয়িতা দ্বিজ ঈশান উপলব্ধি করেছেন যে দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ ছাড়া পালা রচনা করা অসম্ভব। আবার 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালায়' ভেলুয়া ও আমির সাধু র বিবাহে প্রতিবেশী নারীদের জয়ধ্বনি বাঙালির চিরাচরিত লোকাচারকে মনে করিয়ে দেয়। আবার 'কমলা কন্যা পালায়' কমলার বিবাহে বাঙালির চিরাচরিত লোকাচার নান্দীমুখ, গায়ে হলুদ, সাতপাক ঘোরা , শুভদৃষ্টি ইত্যাদির উল্লেখ আছে-

"সাতপাকে ঘুরে কন্যা বরের চৌদিকে
শুভযোগে হইল দুহার মুখ চান্দিকে''।। [৫৪]

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত সমস্ত লোকাচার ও লোকবিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ খন্ডের 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় রঙ্গমালার বিবাহের পর পিত্রালয়ে গমনের সময় লোকাচার অনুযায়ী জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাক, কাঁসি ইত্যাদির বাজনা ও শোনা যায়। এই বিবাহে এয়োস্ত্রীগনের গান গাওয়া ও মালাবদল এর মতো বাঙালির স্বাভাবিক লোকাচার লক্ষিত হয়। 'মানিক তারা ডাকাইত' পালায় বাসু ও মানিক তারার বিবাহে জয়ধ্বনির সঙ্গে নানা লোকাচারের মতো ধান, দূর্বা দিয়ে আশির্বাদ করার রীতি ও প্রচলিত ছিল। 'রঙ্গমালা সুন্দরী' পালায় সমকালের মানুষ ঘরের চালে কাক ডাকার মতো নানা বিষয়কে সর্বনাশের কারণ বলে বিশ্বাস করত। পালা রচয়িতা এ সম্পর্কে বলছেন-

"ঘরের চালত কাউত ডাকিল তেতই গাছে পেঁচা।
গোয়াইল ঘরত গাই ডাকিল আইল ফেচা।।'' [৫৫]

এই পেঁচার ডাক, কাকের ডাক বা গরুর ডাক শুনে বাসুর মা, পুত্র বাসুর অকল্যান আশঙ্কা করে। 'মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালা'য় মানুষ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী আশ্বিন মাসে দূর্গাপূজা করে, কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা করে এবং অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজা করে। উপরোক্ত লোকসংস্কার ও লোসবিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত।

পঞ্চম খন্ডের 'কমল সদাইগরের পালায়' বাঙলির চিরাচরিত লোকাচারকে পালা রচয়িতা সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন—

"বৈশাখ মাসে তুলসী বিরিক্ষে বান্ধি দেয় ঝরা
আকাশ পরদীপ দেয় কত্ত মনের হরষে।।'' [৫৬]

এই খন্ডের 'বারোতীর্থের গান' পালায় রাজা ভগদত্ত তার মাকে বলেছে বাড়িতে পুকুর কেটে তাতে বারোতীর্থ থেকে আনা জল পুকরে দিয়ে সেখানে স্নান করলে সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে অন্তিম কালে স্বর্গলাভ হবে। 'কমল সদাইগরের পালার' বন্দনা অংশে অজ্ঞাত কবি দেবী সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। 'কমল সদাইগবের পালায়' কমল সদাইগর লোকবিশ্বাস বশত বসুমতি, মনসা, দূর্গা, কার্তিক, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাঅর্চনা করতেন। ' কবরের কান্না'

পালায় সকলের মঙ্গল কামনায় হিন্দুরা মা কালীকে স্মরণ করে, আর মঘরা তাদের উপাস্য দেবতা ফরাকে স্মরণ করে। উপরোক্ত নানাপ্রকার লোকাচার, লোকবিশ্বাস এবং দেবতার প্রতি আস্থা আসলে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত।

ষষ্ঠ খন্ডের 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা'য় মুরাই সদাগর তার দুইকন্যা ভেলুয়া সুন্দরী ও মেনকা সুন্দরীর বিবাহ উপলক্ষে কন্যাদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় লোকবিশ্বাস বশতঃ গ্রামের সমস্ত দরিদ্র মানুষকে রজত কাঞ্চন দান করে। 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মী ঝাঁপি' পালায় বাইন্যা বউ চন্ডীমন্ডপে লক্ষ্মীর ঝাঁপি রেখে যেমন নানা কুলাচার পালন করে, তেমনি গুরুপূজা ও কুমারী পূজা ও করে।' ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা'য় বাণিজ্য যাত্রার উন্নতি কামনায় মদন সাধু মা দুর্গা ও মা ভবানীর নাম স্মরণ করে। রচনার সমসাময়িক কালে সদাগর গন শুভদিন ক্ষন স্থির করে পদ্মা দেবীর নাম স্মরণ করে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে পড়ত। পালায় এর বর্ণনা আছে—

"শুভ দিনে শুভক্ষনে জয় পদ্মা স্মরি
পাল উঠাইল সাধুর যত তরী"।।[৫৭]

উপরোক্ত লোকাচার ও লোকবিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

সপ্তম খন্ডের 'সন্নমালার পালায়' আমরা দেখতে পাই সাই সদাগর বাণিজ্য করে দেশে ফিরলে সদাগরের সাত বউ লোকাচার মেনে ধান, দূর্বা, ইত্যাদি অর্ঘ্যাদি সহকারে জয়ধ্বনি করে সপ্তডিঙ্গা পূজা করে, বরণ করে ধনদৌলত ঘরে তোলে। অজ্ঞাত পালা রচয়িতা পালায় তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"সাই সদাগর সাত বউ। ডিঙ্গার গলুয়ে ধান
দূর্বা, সিন্দুর, ঘিয়ের বাত্তি সাত বরণডালা সাত বউ
সাত ডিঙ্গা অর্ঘ্যা পুচ্ছা ঘরে ধনদৌলত তুল্য নিল।।"[৫৮]

'চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ 'পালায় মাধব নামে এক জেলে দেবী মনসার নাম স্মরণ করে নদীতে জাল ফেলে। এবং মাধবের বিশ্বাস এজন্য সে অনেক বেশি মাছ পায়। এই পালা রচনার সমসাময়িককালে পুর নারীগন পরিবারের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী, শীতলা, মঙ্গলচন্ডী, বলদূর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজা করত। উপরোক্ত লোকাচার ও লোকবিশ্বাস আসলে বিশ্বাস ও সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত।

(৫) খেলাধূলা কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ—

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'প্রথম খন্ডের 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় মহুয়া বেদের দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে নানা প্রকার বাজী বা খেলা দেখিয়ে বেড়াত। বেদের দলের সর্দার হুমরা বেদে খুব ছোটবেলা থেকে মহুয়াকে নানাপ্রকার খেলা শিখিয়ে দক্ষ খেলোয়াড় করে তুলেছে। এমনকি অলৌকিক সমস্ত খেলা দেখাবার জন্য হুমরা বেদের কাছে রাও চন্ডালের হাড় বা খেলা দেখাবার জন্য যাদুদন্ড ও ছিল। পঞ্চম খন্ডে 'ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী' পালায় শৈশবে ছুরত জামালকে বনের রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলা করতে দেখি। ষষ্ঠ খন্ডে 'মলুয়া কন্যার পালায়' যেমন পাশা খেলার উল্লেখ আছে, তেমনি সপ্তম খন্ডে কবি 'চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' পালায় রামচন্দ্র ও সীতা দেবীর মধ্যে পাশা খেলার উল্লেখ আছে—

"পড়িল পাশার দানগো খেলিতে খেলিতে
হারিলেন রামচন্দ্র গো সীতাদেবী জিতে।।"[৫৯]

উপরোক্ত সমস্ত লোকক্রীড়া আসলে খলাধূলা কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

(৬) অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' প্রথম খন্ডের 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় বাঁশির আওয়াজ শুনে পালং সই মহুয়াকে ইসারায় নদ্যার চাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার 'শ্যামরায়ের পালায়' বিবাহের দিনে নারীপুরুষ মিলে বাজনার তালে তালে গাবরের নৃত্য করে। পালা রচয়িতা পালায় তার উল্লেখ করেছেন—

'' আইল বিয়ার দিন বাজিল বাজন্ ।
নারীপুরুষ মিইল্যা হইল গাবরের নাচন।।" [৬০]

দ্বিতীয় খন্ডের 'আমিনা বিবি নছর মালুম' পালায় আমরা দেখি একশ্রেণীর মহিলারা মুচকি হেসে পুরুষদের মন হরণ করে। তৃতীয় খন্ডে 'কমলা কন্যার পালায়' কারকুন চোখের ইসারায় কত নারীকে বশ করে তার ইয়ত্তা নেই । চতুর্থ খন্ডের 'মানিকতারা ডাকাইত' পালায় বাসু সুন্দরী কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে টেরা চোখে তাকায় ।

পঞ্চম খন্ডে ' কমল সদাইগরের পালা'য় সোনাই চোখের ঠমকে পুরুষদের পরান কেড়ে নেয়। ষষ্ঠ খন্ডে 'কুমার বীর নারায়নের পালা'য় সোনমনি বীরনারায়ন কে আড়নয়নে দেখে। আবার 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা'য় ভেলুয়া সুন্দরী, মদন সাধুর দিকে আড়নয়নে তাকিয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্ন পালায় ইসারায় মনের ভাব প্রকাশ বা আড়নয়নে তাকানো বা লোকনৃত্য করা আসলে অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত।

তথ্যসূত্র ঃ—

১. প্রণব সরকার - বাংলার লোকসমাজ ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৩, লোকপ্রকাশন,সোনারপুর, কোল - ১৫০, পৃষ্ঠা নং - ৬৬।

২. দুলাল চৌধুরী - বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃঃ- ২১, সংগৃহীত - প্রণব সরকার- বাংলার লোকসমাজ ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৩, লোকপ্রকাশন, সোনারপুর, কোল - ১৫০,পৃষ্ঠা নং - ৬৭।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গ্রামসাহিত্য / লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা নং - ৭১৬

৪. ওয়াকিল আহমেদ - বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা। ১৯৭৪, পৃষ্ঠা নং - ৩

৫. মুনমুন চট্টোপাধ্যায় - মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ পূণর্বিচার, প্রথম মূদ্রণ - মার্চ ২০১২, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯,পৃষ্ঠা নং - ১৩৯।

৬. মানস মজুমদার - লোক ঐতিহ্য-চর্চা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১০, দেজ পাবলিশিং কলিকাতা - ৭৩ পৃষ্ঠা নং - ১৩৪

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - মেয়েলি ছড়া। সংগৃহীত - বরুণ কুমার চক্তবর্তী, ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত - বাংলার লোকসংস্কৃতি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০১৩, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স কলিকাতা - ৯ পৃষ্ঠা নং - ৪৪।

৮. মীর আবুসালেক অনুদিত 'কথ্যশিল্প' ঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা শরৎ সংখ্যা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা নং - ৪৫।

৯. *Folklore, Calcutta, January- 1965, Vol. vl, No - 1, Page No - 13*

১০ আশরাফ সিদ্দিকি - লোকসাহিত্য, ঢাকা - ১৯৬০, পৃষ্ঠা নং - ১

১১. *Folklore, Calcutta, january 1965, Vol . vi, No - 1 Page No - 15*

১২. আশুতোষ ভট্টচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ - ১৯৫৭,পৃষ্ঠা নং - ১৫

১৩. ডঃ মযহারুল ইসলাম - ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন , পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা,পৃষ্ঠা নং - ৫০।

১৪ আশরাফ সিদ্দিকি - লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, ১৯৭৭, ঢাকা পৃষ্ঠা নং - ২৭

১৫. আশুতোষ ভট্রাচার্য - বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ - ২০১২,পৃষ্ঠা নং - *ix*

১৬. ডঃ মযহারুল ইসলাম - ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,পরিবর্তিতও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৭৪, পৃষ্ঠা নং - ৫০।

১৭. *A..H Gayton - Perspective in Folklore , Journal of American Folklore, Vol. 64252- April - June, 1951, Page No - 147*

১৮. *William Bascom - The forms of Folklore ,Prose Narrative Journal of American Folklore , Vol. 84, No - 331 , January- March, 1971, Page No - 41*

১৯. *Don Ben Amous- Towards a Definition of Folklore Context Journal of American Folklore, Vol- 84, No- 331, January- March , 1971, Page No - 13-14*

২০ *Archer Taylor - Folklore and the students literature, The public Spectator, Vol- 2,1948, Page No - 216*

২১ আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকশ্রুতি, ১৯৬০, পৃষ্ঠা নং - নিবেদন অংশ।

২২. অরুণ কুমার রায় - লোকায়ন চর্চার ভূমিকা, লেখা ও রেখা প্রকাশন, শ্রাবন - আশ্বিন,১৯৭৫, পৃষ্ঠা নং - ৩১

২৩. পবিত্র সরকার - লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ এপ্রিল, কলি - ৭৩ পৃষ্ঠা নং - ২৯

২৪. *Fancis Lee Utley - Folk Literature An operational Definition, Journal of American Folklore (JAF),Vol - 74 (1961), Page No - 193*

২৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খন্ড); প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০; ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, সুন্দরী মলুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ১০২

২৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড); প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৪৮

২৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড); প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, শীলাদেবীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৩৩

২৮ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২; ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৬৪

২৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কবরের কান্না পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৫

৩০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তণ পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৯

৩১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা - ১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ, পৃষ্ঠা নং - ২৯৬

৩২ . ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খন্ড); প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯

৩৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ২৯

৩৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কাঞ্চন কন্যা (ধোপার পাট) পালা, পৃষ্ঠা নং - ২১

৩৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা রানীর পালা, পৃষ্ঠা নং - ৮০

৩৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, সদাগর কন্যা বগুলা, পৃষ্ঠা নং - ২৩৪

৩৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৩৫

৩৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কাঞ্চন কন্যা (ধোপার পাট) পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫০

৩৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, লীলা কন্যা কবি কঙ্ক পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৬

৪০ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১; ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা কন্যার পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৯৯

৪১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৪

৪২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, মানিকতারা ডাকাইত পালা, পৃষ্ঠা নং - ২৭১

৪৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২,রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৭৮

৪৪ ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৯

৪৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫০

৪৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কুমার বীর নারায়ণের পালা,পৃষ্ঠা নং - ৪৯

৪৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কুমার বীর নারায়ণের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩২

৪৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তণ পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৯

৪৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, দেওয়ান ইশাখাঁর পালা,পৃষ্ঠা নং - ১৯৮

৫০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৩

৫১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড), প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৫৭

৫২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালা, পৃষ্ঠা নং - ৪৭

৫৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, সদাগর কন্যা বগুলা পালা, পৃষ্ঠা নং - ২২৭

৫৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭১, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কমলা কন্যার পালা, ;পৃষ্ঠা নং - ২৫৩

৫৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭২, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং - ৮২

৫৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৩, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কমল সদাইগরের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৯,১০

৫৭. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা, পৃষ্ঠা নং - ১৫১

৫৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, সন্নমালার পালা, পৃষ্ঠা নং - ১১৬

৫৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৫, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়প্রকাশিত, কলি - ১২, কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ পালা,পৃষ্ঠা নং - ২৩১

৬০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলি - ১২, শ্যামরায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৬১